জালাল উদ্দীন রুমিঃ কবি ও সূফী

আবু মুসা মোঃ আরিফ বিল্লাহ[১]
মোঃ কামাল উদ্দিন[২]

মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ইরান সূফীবাদের উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে এক বিরাট স্থান অধিকার করে আছে। ইসলামী বিশ্বে সূফীবাদের উৎপত্তির ক্ষেত্রে আরবদের বিশেষত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী ও রাবেয়া বসরী প্রমুখগণের অবদান অনস্বীকার্য। পরবর্তীতে এ মতবাদ ইরানের বাবা তাহের উরইয়ান, শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার, হাফিজ সিরাজী, মাওলানা জালাল উদ্দনি রুমী প্রমুখ সাধকগণের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে বিকশিত হয় এবং ইরান, তুরস্ক ও ভারতীয় উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

মরমী কবি মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সূফী সাধকদের অন্যতম। তিনি তাঁর মসনবী সাহিত্যে আধ্যাত্মিক বিষয়াবলী বিভিন্ন উপমা ও রূপকের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। এই আধ্যাত্মিক দর্শন তাঁর পূর্বের দু'জন বিখ্যাত সুফী কবি হাকিম সানাঈ ও ফরীদ উদ্দীন আত্তারের মাধ্যমে লালিত হয়েছিল। বস্তুতঃ মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী তাঁদের স্তর অতিক্রম করে এ দর্শনকে একটি উন্নত ও বিস্তৃত পরিসরে উন্নীত করতে সক্ষম হন, দার্শনিক কাব্যিক ও সূফীতাত্ত্বিক দিক থেকে যার কোন তুলনা নেই। তাঁর লিখন পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু এতই মৌলিক ছিল যে, এটাকে সদ্য উদ্ভাবিত একটি নতুন পদ্ধতি হিসেবেই বিবেচনা করা যায়।

মাওলানা রুমীর আসল নাম মোহাম্মদ। উপাধি জালাল উদ্দীন। পিতার নাম মোহাম্মদ সুলতান বাহাউদ্দীন ওয়ালাদ। মাওলানার পিতামহের নাম হুসাইন বালখী। রুমীর পিতামহ হুসামুদ্দীনও একজন অতি উচ্চ পর্যায়ের সুফী ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন।[১] মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সূফী দার্শনিক এই মরমী কবি পারস্যের খোরাসান প্রদেশের অন্তর্গত বল্‌খ্‌ শহরে ৬ই রবিউল আউয়াল ৬০৪ হিজরী তথা ১২০৭ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[২] মূলতঃ তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় পশ্চিম তুরস্কের কুনিয়া শহরে অতিবাহিত করেন বিধায় তিনি 'রুমী' নামে আখ্যায়িত হন। কেননা তৎকালীন যুগে পশ্চিম তুরস্ক মুসলিম বিশ্বে 'রুম' বলেই পরিচিত ছিল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আফলাকী তাঁর 'মানাকিবুল আরেফীন' গ্রন্থের ভূমিকায় রুমীকে 'সিররুল্লাহিল আযম' বা 'মহান আল্লাহর রহস্য' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেছেন। উল্লেখ্য যে, রুমীর পূর্ব-পুরুষগণ ইসলামের প্রথম

১. সহকারী অধ্যাপক, ফার্সী ও উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২. প্রভাষক, ভাষা বিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। এ প্রসেঙ্গ A. J. Arberry-এর বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

"Less doubt is entertained his claim to the Caliph Abu Bakr as a remote ancestor"[৩]

বিশ্ববিখ্যাত মস্‌নবী গ্রন্থের লেখক মাওলানা জালাল উদ্দীনের সাহিত্য সাধনা নানাবিদ উৎকর্ষতায় ভরপুর। কল্পনার মৌলিকতা ও বৈচিত্র্য সম্ভ্রম ও পরিমিতিবোধ, পাণ্ডিত্য, স্বচ্ছতা সাবলীল আকর্ষণ অনুভূতি ও চিন্তার গভীরতা ছিল তাঁর রচনাশৈলীর বেশিষ্ট্য।[৪] প্রখ্যাত ফার্সী সাহিত্য সমালোচক Joel Waiz Lal বলেন ঃ

"Its deep fervent spirit, tremendous enthusiasm, matchless beauty, high moral teaching, severe dignity of style, brilliancy of colouring and consummate melody, make it unquestionably one of the most powerful books."[৫]

মাওলানা রূমীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে 'মসনবী'। ড. যাবীহউল্লাহ সাফার মতে, এতে প্রায় ২৬,০০০ পংক্তি রয়েছে।[৬]

ড.তাওফীক হা. সুবহানীর মতে ৬ খণ্ডের পূর্ণাঙ্গ মস্‌নবীতে সর্বমোট ২৬,০৩২ পংক্তি রয়েছে। প্রথম খণ্ডে ৪,০০৩টি, দ্বিতীয় খণ্ডে ৩,৮১০টি, তৃতীয় খণ্ডে ৪,৮১০ টি, চতুর্থ খণ্ডে ৩,৯৫৫ টি, পঞ্চম খণ্ডে ৪,৬৩৮ টি এবং ষষ্ঠ খণ্ডে ৪,৯১৬টি পংক্তি রয়েছে। অধ্যাপক নিকলসনের মতে, ছয় খণ্ডের পূর্ণাঙ্গ মস্‌নবীতে সর্বমোট ২৫,৬৩২ পংক্তি রয়েছে।[৭]

রূমীর অপর এক সাহিত্যকর্ম হচ্ছে 'দীওয়ান-ই-শামস্‌-ই তাব্‌রিযী'। এতে গযল ও তারজীবান্দ পংক্তির সংখ্যা ৩৬,৩৬০, রুবাঈ পংক্তির সংখ্যা ৩,৬৭৬ এবং সর্বশোট পংক্তি সংখ্যা হচ্ছে ৪০,০৩৬।[৮]

ড. মুহাম্মদ মুঈন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'ফারহাঙ্গে ফার্সী'তে দীওয়ান-ই-শাম্‌স্‌-ই-তাব্‌রিযীর পংক্তি সংখ্যা ৫০,০০০ বলে উল্লেখ করেছেন।[৯]

মাওলানার পিতা বাহাউদ্দীন অত্যন্ত বিদ্বান, তেজস্বী বক্তা এবং অসামান্য ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অগণিত অনুসারী ছিল। পিতার কাছ থেকে রূমীর শিক্ষা জীবনের সূত্রপাত ঘটে। তিনি তাঁর কাছ থেকেই জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রভূত বুৎপত্তি অর্জন করেন। A.J. Arberry এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

"Rumi received his early education from his father, a good scholar, who recorded his meditations in a book entitled *Marif*, the influence of his instruction and writings is apparent in Rumi's own work."[১০]

বাহাউদ্দীনের প্রভাব প্রতিপত্তি এত ব্যাপক ছিল যে, খাওয়ারিজমের বাদশাহ পর্যন্ত তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হন। ফলে বাহাউদ্দীন সপরিবার মাতৃভূমি বল্‌খ্‌ ত্যাগ

করে হেরাত ও তুসের পথ ধরে ১২১৯ খ্রীষ্টাব্দে নিশাপুরে এসে উপনীত হন। তাছাড়াও শাসক শ্রেণীর অত্যাচার নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ সময় হাজার হাজার লোক দেশ ত্যাগ করতে থাকেন।

Dr. Najibullah তাঁর Islamic Literature গ্রন্থে বিষয়টিকে এভাবে উপস্থাপন করেন ঃ

"In 1219, a year before the Mongol invasion, Baha-Uddin left Balkh with his family, and by way of Herat and Tus, arrived in Nishapur. It is related that a grievance of the emperor of Khawarazm, who was at that time ruler of all the Iranian plateau and Turkestan, was the reason for Baha-Uddin's departure."[১১]

বাহাউদ্দীন নিশাপুরে পৌঁছলে তথায় ফরীদ উদ্দীন আত্তার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ছয় বছর বয়স্ক রূমীর ব্যাপারে তাঁকে যত্ন নিতে বলেন। এছাড়াও তিনি ভবিষ্যতবাণী স্বরূপ বলেন ঃ

این فرزند را گرامی دار، زود باشد که نفس گرم آتش در سوختگان عالم زند

"এই বালকের যত্ন নিও, অচিরেই তাঁর উষ্ণ নিশ্বাসে উত্থিত প্রেমের আগুন দিয়ে এই পৃথিবীর প্রেমিকদের পোড়াবে"। এছাড়াও সূফী কবি আত্তার স্বীয় বিখ্যাত গ্রন্থ 'আসরার নামেহ্' বালক রূমীকে স্নেহাশীষ উপহার দেন। ১২৩০ খ্রীস্টাব্দে পিতা কুনিয়ায় মৃত্যুবরণ করলে রূমীর উস্তাদ সাঈয়্যেদ বোরহান উদ্দীন কুনিয়ায় আসেন। বোরহান উদ্দীনের সংস্পর্শে রূমী ২৫ বছর বয়সেই খোদা প্রেমে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন এবং পরবর্তী ১০ বছর তাঁর পীরের অনুকরণে সুফীজগতের সকল স্তর অতিক্রম করতে থাকেন। ১২৪০ খ্রীস্টাব্দে বোরহানউদ্দীনের মৃত্যুর পর তিনি শাইখ হিসাবে কাজ শুরু করে। তাঁর উদ্দীপনায় ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে দৈনন্দিন শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। Dr. Najibullah বলেন,

"One of his countrymen from Khorasan and an old friend of his father, the mystic Burhanuddin of Tirmiz, came to Qoniya. He initiated Rumi into the mysteries to sufism, and at the time of his death in 1240, Rumi was already recognized as a great scholar and mystic, and had a score of devoted disciples."[১৩]

মাওলানা রূমীর উপর শামসে তাবরিযীর প্রভাব

এছাড়াও বিখ্যাত সূফী দরবেশ শামসে তাবরিযী মাওলানার আধ্যাত্মিক দর্শন বিকাশের ক্ষেত্রে আলোকিত সূর্যের ন্যায় প্রভাব বিস্তার করেন। এ মনীষীর পুরো

নাম শামসুদ্দীন মোহাম্মদ বিন আলী বিন মালিকদাদ তাব্‌রিযী। তাঁর পরিবার-পরিজনও তাব্‌রিযের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন জালাল উদ্দীন হাসানের পুত্র। আফলাকির বর্ণনা মতে, শামসুদ্দীন তাব্‌রিযী প্রথম দিকে আবু বকর যানবিলবাফ এবং সিল্লেবাফ্‌ তাবরিযীর মুরিদ (শিষ্য) ছিলেন। তিনি যুগের বিখ্যাত আরেফগণের নিকট থেকে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়াতেন বিখ্যাত পণ্ডিতবর্গের সান্নিধ্যে যেতেন আবার কখনও কখনও শিক্ষকতাও করতেন।[১৪]

শামসে তাবরিযীর কুনিয়ায় আগমন

শামসে তাবরিযীর ৬৪২ হিজরীর ২৩শে জামাদিউল আউয়াল শনিবার প্রত্যূষে কুনিয়ায় পৌছেন। স্বীয় অভ্যাস অনুযায়ী তিনি চিনি বিক্রেতার পান্থশালায় উঠে একটি কামরা ভাড়া নিতেন। কামরার দরজায় দুই তিন দীনার তালার সাথে ঝুলিয়ে রাখতেন, চাবিটি পাগড়ীর সাথে ঝুলিয়ে রাখতেন, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। অথচ কক্ষে একটি পুরাতন বিছানা, ভাংগা জগ এবং কাঁচা ইটের বালিশের অতিরিক্ত কিছুই থাকত না।[১৫]

মাওলানা রূমীর সাথে শামসে তাবরিযীর সাক্ষাত লাভ

আফলাকির বর্ণনা মতে, কোন এক রজনীতে শাম্‌সে তব্‌রিযী তাঁর মোনাজাতে বলেন, "হে প্রভু! তোমার গোপন বন্ধুদের কারো সাথে আমার সান্নিধ্য লাভের সুযোগ করে দাও।" তাকে সম্বোধন করে বলা হলো, "ওহে আল্লাহর গুপ্ত রহস্যের সন্ধানকারী, তুমি যার সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশী তিনি হচ্ছেন বালখের সুলতান বাহাউদ্দীনের পুত্র।" তিনি বলেন, "হে প্রভু! আমাকে তাঁর সান্নিধ্যে পৌছাও।" উত্তর এলো, "তুমি রূম দেশে চলে যাও, তাহলে তুমি কাংক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে পারবে।" অতঃপর তিনি রূম দেশের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। তিনি কুনিয়ায় এক চিনি বিক্রেতার পান্থশালায় পৌঁছে একটি কক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। একদা তিনি পান্থশালার দরজায় উপবিষ্ঠ ছিলেন। দেখতে পেলেন মাওলানা রূমী একটি খচ্চরে আরোহন করে মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে আসছেন। আলেম ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গ খচ্চরের লাগাম ধরে পায়ে হেঁটে হেঁটে পথ অতিক্রম করছে। শাম্‌সে তাব্‌রিযী উঠে দাঁড়ালেন এবং কাছে গিয়ে খচ্চরের লাগাম ধরে বললেন, "হে পৃথিবীর বিজ্ঞ সমালোচক ও আধ্যাত্মিক মনীষী! বলুন, হযরত মুহাম্মদ (স.) মহান, নাকি বায়োযিদ বোস্তামী?" উত্তরে তিনি বললেন, "হযরত মুহাম্মদ (স.)"। মাওলানা রূমী এ প্রশ্নের আকস্মিকতায় মানসিকভাবে আমূল পরিবর্তন হয়ে যান এবং শাম্‌সে তাবরিযীর প্রেমে পাগলপারা হয়ে উঠেন। তিনি চল্লিশ দিন মতান্তরে তিন মাস শাম্‌সে তাবরিযীর সাথে নির্জনে অতিবাহিত করেন। অনুরূপভাবে একধা শেখ বোরহানউদ্দীন (সাজ্জাসি) শাম্‌সে তাব্‌রিযীকে বলেন, "তোমার রূমে যাওয়া

উচিত, সেখানে যে অগ্নি রয়েছে সেই অনলে তোমার দগ্ধীভূত হওয়া উচিত।" শাম্‌স স্বীয় পীরের ইশারায় রূমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কুনিয়া শহরে উপনীত হয়ে তিনি দেখেন, মাওলানা একটি খচ্চরে আরোহন করে মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন। একদল আলেম তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরে পথ অতিক্রম করছেন। শামস তাঁর নিকটে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করেন, কঠোর আত্মসংযম বা কৃচ্ছ্ সাধন এবং জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য কী? মাওলানা বলেন, "শরীয়তের নিয়ম-কানুন, রাসূলের সুন্নাৎ ও তাঁর পদ্ধতি অনুসরণ।" শামস বলেন, "এসবইতো হচ্ছে বাহ্যিক অর্থ"। মাওলানা বলেন, "তাহলে এর অর্থ কী? তিনি বলেন, "জ্ঞানতো হচ্ছে যার মাধ্যমে প্রকৃত সত্যে উপনীত হতে পারা যায়।" তিনি আরও বলেন ঃ "যে জ্ঞান তোমাকে তোমা হইতে ছিনাইয়া নিয়া তাঁহার ক্রোড়ে ধারণ না করে ঐ জ্ঞান হইতে মূর্খতা শতগুণে ভাল।"[১৬]

ইবনে বতুতার বর্ণনা মতে, মাওলানা রূমী কর্ম জীবনের শুরুতেই ইসলামের বিধি বিধান (ফিক্‌হ) বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। জ্ঞান পিপাসুগণ কুনিয়ার একটি মাদ্রাসায় তাঁর কাছে একত্রিত হতো। একদা এক হালুয়া বিক্রেতা তাঁর কাছে এসে তাঁকে হালুয়া খেতে দিলেন। তিনি হাতে নিলেন এবং খেয়ে ফেললেন। হালুয়া বিক্রেতা চলে গেলেন এবং অন্য কাউকে খেতে দেননি। এরপর মাওলানা রূমী তাঁর পিছনে চলে গেলেন এবং শিক্ষাদানের জন্যে আর ফিরে আসেননি। ছাত্ররা সুদীর্ঘকাল তাঁর প্রতীক্ষা থাকলেন। অতঃপর তাঁর অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু কেউ তাঁর অবস্থান স্থল খুঁজে পেলেন না।[১৭] মাওলানার নিজের একটি কাব্য-চরণেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

مولوی ہرگز نہ شد مولای روم - تا غلام شمس تبریزی نہ شد

অর্থাৎ শামসে তাবরিযীর গোলাম না হওয়া পর্যন্ত মৌলভী কখনও রূমের প্রতিভূ হতে পারেনি। মাওলানার স্বীয় কাব্য সাধনার একটি বিরাট অংশ তাঁর এই রুহানী পীরের নামে উৎসর্গ করেন যা 'দীওয়ানে শাম্‌সে তাব্‌রিযীর নামে পরিচিত। এ প্রসঙ্গে ইসলামী বিশ্বকোষের বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য ঃ

> "দীওয়ান, গাযাল ও চতুষ্পদী কবিতার সংকরন, ইহাতে তুর্কী ও গ্রীক কবিতাও স্থান পাইয়াছে। ইহা সাধারণ মানুষের সহিত এবং কুনিয়ার অমুসলিমদের সহিত তাঁর সম্পর্কের কথা তুলিয়া ধরে। তিনি এই গ্রন্থখানি শামস তাব্‌রিযীর নামে উৎসর্গ করেন।"[১৯]

মাওলানার সুযোগ্য শিষ্য সালাউদ্দীন যিনি ৪০ বছর মাওলানা খেদমত করেছিলেন, তিনি বলেন ঃ শামসে তাবরিযীর সাথে দেখা হওয়ার পর মাওলানা তাঁর সাথে একাধারে তিন মাস মতান্তরে চল্লিশ দিন 'চিল্লাকাশি' (একাধারে ৪০

দিন নির্জনে বসে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকা) করেন। মাওলানার এই অস্বাভাবিক পরিবর্তনে তাঁর শিষ্য ও শুভাকাঙ্ক্ষীগণ শামসে তাবরিযীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠে। ফলে তিনি চুপিচুপি কুনিয়া ত্যাগ করে সিরিয়ায় পৌঁছে যান। পরবর্তীতে মাওলানার অনুরোধে তিনি পুনরায় কুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। পরবর্তীকালে তাঁকে হত্যার জন্য তারা প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁকে কটাক্ষ ও তিরস্কার করতে থাকেন। তাঁর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া থেকে শুরু করে তাঁকে 'ধর্মহীন', 'অমুসলিম' বলে অভিহিত করতে থাকে। মাওলানা রূমীর মুরীদ ও আত্মীয় সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের একটি দল তাঁর বিরুদ্ধে ফেতনায় জড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করতে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু তাঁর সর্বশেষ পরিণাম সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায়নি যে, তিনি ঐ বিশৃঙ্খলায় নিহত হয়েছেন, নাকি ওয়ালাদ নামার বর্ণনা মতে কুনিয়া থেকে পালিয়ে গেছেন। শামসে তাবরিযী ৬৪৫ হিজরীতে অদৃশ্য হয়ে যান। তাঁর কোন নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই বিভিন্ন স্থানকে তাঁর সমাধিস্থল বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।[২০] A.J. Arberry-এর প্রসঙ্গে বলেন ঃ

> "Finally, perhaps in 1247, the man of mystery vanished without leaving a trace behind. Following his final disappearance it was rumoured in Qoniya that Shams al-Din was dead, murdered, said some, at the hands of certain jealous disciples of Rumi."[২১]

শামসে তাবরিযীকে নিয়ে রূমীর রচিত একটি কবিতার অনুবাদ মরহুম কবি আব্দুস সাত্তার করেছেন এভাবে–

"তাব্রীজের কি গৌরব শামসের দ্বীপ্ত মুখচ্ছবি,
আলোকে বিকীর্ণ করা কি উজ্জ্বল তেজোদ্দীপ্ত রবি।
সে সূর্যের চারপাশে অজস্র মেঘের আনাগোনা,
যেন সে হাজার আত্মা খোঁজে ফেরে আলোকের কণা।[২২]

মাওলানা রূমী শামসে তাবরিযীর এত বেশি ভালবেসেছিলেন যে, তাঁর বিরহে তাঁর সুপ্ত কাব্য প্রতিভা বিকশিত হয়ে পড়ে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, শামসে তাবরিযীর সান্নিধ্যের দরুনই মাওলানা তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা গোপন রহস্যসমূহ গল্পে কাহিনীর আঙ্গিকে জনসমক্ষে তুলে ধরার সার্থক প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি স্বীয় বক্তব্যমালাকে কাহিনী ও ঘটনার পরম্পরায় বর্ণনা করেছেন।

মাকালাত গ্রন্থটিতে এই গোপন রহস্যের পর্দা এবং শামসে তাবরিযীর প্রতি মাওলানার সম্পর্ক ও প্রেমাসক্তি প্রভৃতি অতি চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়াও শামসে তাবরিযীর সূক্ষ্মদর্শী, জ্ঞানী, হাকীকতের গুরু এবং সুযোগ্য মুরশিদরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এসব বিষয়ই গ্রন্থটিকে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে তুলে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও শামসে তাবরিযীর মাওলানা

রূমীর জীবনে নবদিগন্তের সূচনা করে। সম্ভবতঃ সকল গবেষক ঐকমত্য পোষণ করবেন যে, মাওলানা রূমী শামসে তাবরিযীর সকল চিন্তা-চেতনা ও শিক্ষা-দীক্ষার মূলনীতি গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম ও আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মাকালাত গ্রন্থ থেকেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মনবী ও মাকালাতের মধ্যে শক্তিশালী সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। মাকালাতের অনেক উপমা, কাহিনী ও বিষয়বস্তুকে মাওলানা তাঁর মসনবীতে সন্নিবেশিত করেছেন।[২৩]

একথা বলা যায় যে, প্রস্তরের মাঝে যেমন অগ্নি লুক্কায়িত থাকে মাওলানার মধ্যেও তেমনি কাব্য প্রতিভা লুক্কায়িত ছিল; কিন্তু শামসের বিরহ-চকমতির আঘাতে তাঁর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিমূর্ত হয়ে উঠে।

মাওলানা রূমী হুসামুদ্দীন চেলেবির অনুরোধে এবং উৎসাহে মসনবী কাব্য রচনা করেন। হুসামুদ্দীন মাওলানাকে হাকীম সানাঈ-এর "হাদীকায়ে সানাঈ" অথবা ফরীদ উদ্দীন আত্তারের "মানতেকুত্তায়ের" এর পদ্ধতিতে একটি কিতাব রচনার প্রস্তাব দেয়ার ফলে মাওলানা মসনবী কাব্য লেখা শুরু করেন। মসনবী রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে The Encyclopaedia of Islam-এ নিম্নরূপ বক্তব্য এসেছে ঃ

> "The long poem was inspired by Husam al-din Celebi, who suggested to Mawlana that he should produce something like the religious *mathnawis* of Sanai and Attar."[২৪]

মাওলানা রূমী একটি শে'রে নিজেকে সানাঈ ও আত্তারের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন ঃ

عطار روح بود و سنائی دو چشم او - ما از پی عطار و سنائی آمدیم

"আত্তারের ছিল প্রাণ এবং সানাঈ তার দু'টি চক্ষু; আমরা আত্তার ও সানাঈ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এসেছি।" বরকতুল্লাহ্ উক্ত চরণের অনুবাদ করেছেন এভাবে "আত্তার মরমী শিক্ষার প্রাণ ও সানাঈ উহার দুইটি চক্ষু; আমি তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি মাত্র"।[২৫]

বস্তুতঃ মাওলানা নির্বাধে অনর্গল বয়েত আবৃত্তি করতেন আর হুসামুদ্দীন সাথে সাথে তা লিখে ফেলতেন। কোন কোন সময় তাঁদের এ কাজে সমগ্র রজনী অতিবাহিত হয়ে যেত। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন ঃ

صبح شد ای صبح را پشت پناه - عذر مخدومی حسام الدین بخواه

অর্থাৎ "প্রভাত হয়েছে। হে ভোরের অধিপতি পরওয়ার দিগার! আপনি আমার শ্রদ্ধেয় হুসামুদ্দীনের উযর কবুল করুন।"

এ প্রসঙ্গে দৌলতশাহ্ লিখেছেন, মাওলানার গৃহে একটি স্তম্ভ ছিল। মাওলানা যখন খোদা প্রেমে আত্মহারা হয়ে পড়তেন, তখন সেই স্তম্ভ ধরে চারদিক ঘুরতেন এবং মসনবী (দ্বি-পদি কাব্য) বলে যেতেন, শিষ্যেরা তা সাথে সাথে লিখে ফেলতেন। এ বিষয়ে A.J. Arberry বলেন ঃ

> "Daulatshah tells us that there was a pillar in Maulwis house, and when he was drowned in the ocean of love he used to take hold of that pillar and set himself turning round it. Meanwhile he versified and dictated and people wrote down the verses."[২৭]

নিঃসন্দেহে 'বিশ্বব্যাপী মাওলানার খ্যাতি ও পরিচিতির মূলে রয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠ মস্‌নবী কাব্য। এতে সূফী মতবাদ ও এর সাধন প্রণালী ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজবোধ্য করার জন্য রয়েছে অসংখ্য বাস্তব ও কল্পিত কাহিনী, উপকথা, নীতিগল্প, রূপক কাহিনী এবং গভীর চিন্তাধারার সমাহার। মসনবী-ই-মা'নবী, মরমী কাব্য, জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। সূফীবাদে অনুপ্রাণিত কাব্যরূপ মসনবী আজো বিশ্ব সাহিত্যের এক অমূল্য রত্ন। ইহা ইসলামী বিশ্বের চিন্তা ও সাহিত্যের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে আছে। ইসলামী সাহিত্যের ভান্ডারে এই রকম কাব্যগ্রন্থ খুবই বিরল যা ইসলামী বিশ্বের এত ব্যাপক ও বিরাট পরিধিকে এত দীর্ঘকালব্যাপী প্রভাবিত করে রেখেছে। যষ্ঠ হিজরী শতক হতে গ্রন্থখানি মুসলিম বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তি ও সাহিত্য সংস্কৃতিকে নিত্য নতুন প্রেরণা দান করে আসছে।[২৮]

ফার্সী ভাষায় কুরআনী শিক্ষার নির্যাস রয়েছে এই মসনবীতে। কবির ভাষায় ঃ

مثنوی معنوی مولوی ـ ہست قرآن در زبان پہلوی

অর্থাৎ "মৌলভীর আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বলিত মসনবী পাহলভী (ফার্সী) ভাষায় কুরআন (এরই ব্যাখ্যা)" The New Encyclopaedia Britannica-তে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

> "Jalal ad-Din ar-Rumi called Mawlan ("Our master"), was the greatest Sufi-Islamic mystic poet in the Persian Language; he is famous for his lyrics and for his didactic epic masnavi ("The spiritual couplets"), which has been called "the Quran in Persian"."[৩০]

আমাদের জানা থাকা আবশ্যক যে, সূফীতত্ত্বের মূল কথা, মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, রূহ বা আত্মার প্রকৃতি, জীবন এবং মৃত্যু ও জগতের সাথে সম্পর্কিত। ইসলামী বিশ্বকোষ রূমীর মস্‌নবীর সূচনা নিম্নরূপ বক্তব্য এসেছে ঃ

"রূমীর মতে মানবাত্মা ও পরমাত্মা মূলে একই বস্তু, সৃষ্টির আবহে মানবাত্মা পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। জড়দেহের সংশ্রবে আসিয়া সে নিজের পূর্ব ইতিহাস বিস্মৃত হইয়াছে সংসার স্বজন স্বার্থ, আধি-ব্যাধির আক্রমণ এই সব দ্বারা সে নিজের চতুর্দিকে এমন একটি বেষ্টন সৃষ্টি করিয়াছে যে, মুহূর্তের জন্য নিজেকে আর এই বৃত্ত হইতে পৃথক ভাবিতে পারে না। কিন্তু তাহার স্বভাবজাত আকর্ষণ রহিয়াছে নিজের মূল উৎস সেই পরমাত্মার সাথে। পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্নতার করুণ সুর দিয়াই আল্লামা রূমী তাহার মসনবী গ্রন্থের সূচনা করিয়াছেন।"[৩১]

কবির অমর সৃষ্টি বিশ্ব বিখ্যাত মসনবীর প্রথম চরণগুলোতেই তাঁর সূফীতত্ত্বের বাস্তব রূপ ফুটে উঠেছে। মহান আল্লাহর সন্নিধান থেকে প্রকৃতির ফুলে-ফলে সজ্জিত এ মাটির পৃথিবীতে এসে মানবাত্মা একদিকে যেমন পেয়েছে অনুপম শান্তি , অপরদিকে প্রতিটি মুহূর্তে রূহকে প্রকৃতির পরিবেশ ও পাপ পংকিলতার সাথে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। অথচ আল্লাহর নিকট রূহ ছিল পবিত্র। তাই মানবাত্মা যখন পরমাত্মার সাথে তাঁর সম্পর্কের কথা জানতে পারে, তখন পুনরায় তাঁর সান্নিধ্যের পিপাসায় বিলাপ করে। মাওলানার মসনবীর শুরুতে খোদা তা'আলার জন্য যে বিরহ বেদনা তাঁর প্রাণে বেজেছে, তাই তাঁর অতুলনীয় কবিতা শ্লোকে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। তাঁর ব্যাকুল বাঁশরী সকলকে মুগ্ধ করেছে। কবি বলেন ঃ

بشنو از نی چون حکایت می کند ـ از جدائیها شکایت می کند

অর্থাৎ "শ্রবণ কর, বাঁশী কি অবস্থা বর্ণনা করছে; সে বিরহ বিচ্ছেদের অভিযোগ করছে।"

এখানে 'নেই' অর্থ 'বাঁশী' অর্থাৎ মানুষের রূহ উদ্দেশ্য। 'রূহ' হচ্ছে মূল সৃষ্টি অনুসারে পবিত্র ও নুরানী মাখলুক। এর আসল নিবাস 'আলমে আরওয়াহ' বা 'রূহের জগৎ'। সেখানে সে আল্লাহর মোহব্বতে ও যেকেরে মগ্ন থাকতো। দেহের জগতে এসে তার মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, অহংকার কৃপণতা ইত্যাদি নাফসানী দোষত্রুটি যুক্ত হয়েছে যেটা রূহের জন্য বিশেষ ক্ষতি ও দুর্ভাগ্যের অবস্থা, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে সকল রূহ এ অবস্থা উপলব্ধি করতে পারে না। যাদের অন্তর্দৃষ্টি প্রখর আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন তাঁদের রূহ সর্বদা এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য বিলাপ করছে। মাওলানা বলেন ঃ

کز نیستان تامرا ببریده اند ـ از نفیرم مرد وزن نالیده اند
سینه خواہم شرحه شرحه از فراق ـ تا بگویم شرح درد اشتیاق
ہرکسی کو دور ماند از اہل خویش ـ باز جوید روزگار وصل خویش
سرمن از ناله من دور نیست ـ لیک چشم وگوش را آن نور نیست

অর্থাৎ "যখন হতে আমাকে বাঁশবণ হতে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, আমার কান্না ও আর্তনাদে সকলেই ক্রন্দন করেছে। বিরহ বেদনায় বক্ষ ক্ষত-বিক্ষত, আমার প্রেম-বেদনা প্রকাশের জন্য এমন বিদীর্ণ হৃদয়েরই প্রয়োজন। যে কেউ তার মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, সে পুনরায় তার মূলের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে সময়ের অপেক্ষায় থাকে। আমার গোপন রহস্য আমার ক্রন্দন ও আবেগের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কিন্তু চক্ষু ও কর্ণের সেই নূর বা জ্যোতি নেই (যে তা অনুভব করবে)।"

এরপর কবি দেহ ও আত্মার প্রকৃতি সম্পর্কে বলেন ঃ

تن زجان وجان زتن مستور نیست۔ لیک کس را دید جان دستور نیست

অর্থাৎ "দেহ প্রাণ হতে এবং প্রাণ দেহ হতে লুক্কায়িত নহে; কিন্তু প্রাণকে কেহ দেখবে এমন বিধান নেই।" মনির উদ্দীন ইউসুফ মসনবীর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বলেন ঃ

> 'মস্‌নবীর' মূল সূর বা কেন্দ্রগত প্রসঙ্গ প্রেম। তিনি প্রেমকে বিশ্বের আত্মা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রেমেই বিশ্বের সৃষ্টি, প্রেমেই তার বিধৃতি ও প্রেমেই নবতর সৃষ্টি সম্ভাবনার উদ্দেশ্যে বস্তুজগতের বিলয়। সঞ্চরমান জীবনের মূলে রহিয়াছে প্রেম। প্রেমই জীবনের রহস্য। প্রেমের জন্যই বাঁশীর বুকে সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠে। জীবন উৎসের মূলে গিয়া পৌছিবার জন্যই প্রেম বিচ্ছেদের হাহাকারে ক্রন্দন করিতে থাকে। প্রেমের তাগিদ না থাকিলে সুন্দরের দিকে কেউ চোখ তুলিয়া চাহিত না। প্রেমের উন্মাদনায় প্রেমিক পরমাত্মার মুখের ঘোমটা ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য উন্মুখ হয়ে রহস্যের যবনিকা উন্মোচন করে।"[৩৫]

মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ এপ্রসঙ্গে বলেন ঃ

> "মসনবীর বিশেষত্ব এই, ইহা কোনও সাম্প্রদায়িক নীতিগ্রন্থ নহে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইহুদী, কি খ্রীস্টান, তত্ত্ব পিপাসু মাত্রেই ইহাতে গভীর পরমার্থ, প্রেমের অনাবিল ও অফুরন্ত রসধারা উপভোগ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতে পারে। আচার, শাস্ত্রাদেশ বা ধর্মের বাহ্য আচরণ লইয়া ইহাতে কোনও বিতর্ক নাই। মসনবীর প্রেম আর বিরহ, মানবাত্মা ও পরমাত্মায় ভিতরকার শাশ্বত ঐক্য ও প্রেমই কাব্যের বিষয়বস্তু। জালাল উদ্দীন সমস্ত বিশ্বমানবকে এক খোদার সৃষ্টি বলিয়া আপন জানিতেন তাহার কবিতায়ও সেই বিশ্বজনীন উদারতার প্রতিচ্ছবি প্রস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেমের রাজ্যে যে কোন জাতি ও বর্ণ বা দেশভেদ থাকিতে পারে না জালালউদ্দিন মসনবীতে তাহা অতি চমৎকাররূপে দেখাইয়াছেন।[৩৬]

মাওলানা রূমী ফার্সী কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রেমতত্ত্বকে যে অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন বিশ্ব সাহিত্যের তাঁর তুলনা খুঁজে পাওয়া কঠিন। মাওলানা রূমীর ভাষায় ঃ

مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم۔ دولت عشق آمد ومن دولت پاینده شدم

دیده سیرست مرا جان دلیرست مرا۔ زهره شیرست مرا زهره تابنده شدم

অর্থাৎ "ছিলাম মৃত হলাম জীবিত, ক্রন্দরত ছিলাম, সহাস্য হলাম, এশ্‌ক বা প্রেমের সম্পদ এলো, স্থায়ী সম্পদে পরিণত হলাম। পরিভ্রমণের চক্ষু রয়েছে আমার সাহসী প্রাণ রয়েছে আমার, দুধের উজ্জ্বলতা আছে আমার, আলোকচ্ছটায় পরিণত হলাম।"

খোদা প্রেমের মর্মকথা হৃদয়ঙ্গম করা অপরিপক্ক লোকদের পক্ষে দুরূহ বিষয়। তাই কবি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ

در نیابد حال پختہ ہیچ خام۔ پس سخن کوتاه باید والسلام

অর্থাৎ "অপরিপক্ক ব্যক্তি কামেল উয়ালী-আল্লাহগণের অবস্থা উপলব্ধি করতে অক্ষম, সুতরাং বক্তব্য সংক্ষেপে করে সালামের মাধ্যমে বিদায় গ্রহন করাই উত্তম।"

মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হলো, মহান আল্লাহকে ভুলে পার্থিব লোভ-লালসায় আকৃষ্ট হওয়া, তাই কবি গায়রুল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত অপর)-এর সম্পর্ক ছিন্ন করার উপদেশ স্বরূপ বলেন ঃ

گر بریزی بحررا در کوزه ای۔ جند گنجد قسمت یک روزه ای

অর্থাৎ "সমুদ্রকে যদি মাটির কলসিতে ঢাল, তবে কতটুকু ধরবে (খুব বেশি হলে) একদিন ব্যবহারের পরিমাণ।"

কবি ইশককে মূল্যবান ঔষধ এবং আফলাতুন ও জালীনুসের ন্যায় বিজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে তুলনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

ای دوای نخوت وناموس ما۔ ای توافلاطون وجالینوس ما

অর্থাৎ "ওহে! তুমিতো আমাদের অহমিকা ও যশ লিপ্সারূপ ব্যাধির অমোঘ ঔষধ, ওহে (ইশ্‌ক)! তুমি আমাদের আফলাতুন ও জালীনুস (রূপী বিজ্ঞ চিকিৎসক)।"

جسم خاک از عشق برافلاک شد۔ کوه دررقص آمد وچالاک شد

ইশ্‌ক্ এর ফলেই বিশ্বনবী মেরাজে এবং হযরত মূসা (আ) তুর পর্বতে খোদার সাক্ষাত লাভ করেছিলেন; কবি সুন্দরভাবে এর বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

অর্থাৎ "ইশকের বদৌলতে মাটির দেহ আসমানের উপর আরোহন করল, পাহাড় আনন্দে আত্মহারা হয়ে নাচতে লাগল।"

সূফীতত্ত্বের নিগুড় রহস্য অযোগ্য ব্যক্তির নিকট ব্যক্ত করা কঠিন। এ প্রসংগে কবি বলেন ঃ

هرک او ازہم زبانی شد جدا۔ بی زبان شد گرچه دار صدنوا

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি স্বীয় কথার সাথী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, শত ধ্বনির অধিকারী হয়েও সে একেবারে বাকহীন হয়ে গেছে।"

সূফী কবি রূমীর মতে, দেহ, মানবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের অন্তরায়, দেহের ধ্বংসেই আত্মার মুক্তি। দেহের অভ্যন্তরে সেই কামনা মানুষকে সত্য পথ হতে বিচ্যুত করে এবং তাকে লিপ্সু করে তোলে, রূমীর ভাষায় এর নাম 'নফস'। নফসের ধ্বংসই দেহের কর্তৃত্বের অবসান ও আত্মার স্বাধীনতার পূর্ণতা। তাই নফসের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম জীবন ব্যাপী। এ সংগ্রামের অবসান হবে সেদিন যেদিন নফস সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে আত্মার আজ্ঞাবহ হবে। আত্মার মোক্ষম পথে অন্তরায় না হয়ে এর বাহন রূপে প্রযুক্ত হবে। এই অবস্থার নাম 'ফানা' (বিলয়)। এই স্তর অতিক্রম করে যখন আল্লাহতে পূর্ণ সমাপ্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন এক নব জীবনের অধিকারী হওয়া যায়। এই অবস্থার নাম 'বাকা' (অমরত্ব)।[৪৩]

কবির সূফীতত্ত্বের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে তাঁর সর্বেশ্বরবাদী ধারণা যাকে সূফীদের পরিভাষায় 'হামাউস্ত' অর্থাৎ 'সবকিছুই তিনি' অর্থে বিবেচনা করা হয়। দৃষ্টিগ্রাহ্য যাবতীয় বস্তুরাজি নশ্বর ও অস্থায়ী। আল্লাহর সত্তা অনাদি অনন্ত। চিরস্থায়ী সত্তা হতে উদ্ভাসিত নূরের স্পর্শেই পার্থিব জগতের সবকিছু অস্তিত্বশীল হয়ে টিকে আছে। এটাই সর্বশ্বেরবাদী ধারণার মূল কথা।

শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল এ প্রসঙ্গটির অবতারণা করতে গিয়ে বলেন ঃ

"যে ব্যক্তি 'আমিই আল্লাহ' বলিয়া দাবী করিতেছে; সে এক খোদার অস্তিত্বেই কেবল স্থির বিশ্বাস করিতেছে এবং তাহার নিজের অস্তিত্বকে একেবারে লোপ করিয়া দিয়াছে। আমার কোন অস্তিত্বই নাই, কেবল এক তিনিই আছেন, আর তিনি ছাড়া কিছুই নাই, ইহা বিনয়ের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত।[৪৪]

কবি বলেন ঃ

جمله معشوق ست وعاشق پرده ای۔ زنده معشوق ست وعاشق مرده ای

অর্থাৎ "জগতের সবকিছুই মাশুক (প্রেমাস্পদ) আর সমস্ত আশেকই আবরণ, মাশুক জীবিত এবং আশেক মৃত।"

কবি খোদাপ্রেম উপলব্ধির জন্য স্বচ্ছ ও নির্মল আত্মার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

عشق خواہد کین سخن بیرون بود۔ آینہ غماز نبود چون بود

অর্থাৎ "ইশক চায় এর আলোচনা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক। কিন্তু হৃদয়মন স্বচ্ছ না হলে কীরূপে সম্ভব?"

আল্লাহর উয়ালীদের মধ্যে আল্লাহর নূরের অস্তিত্বের বর্ণনায় কবি বলেছেন যে, আল্লাহর ওয়ালীদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নূর দীপ্তিমান থাকে, তেমন অন্তর্দৃষ্টি নিখুঁত হলে তুমি তা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ কবি বলেন ঃ

شمس در خارج اگرچہ ہست فرد۔ لیک اوہم میتوان تصویر کرد
لیک آن شمسیکہ شد بندش اثیر۔ نبودش درذہن ودر خارج نظیر
در تصور ذات اور اگنج کو۔ تادر آید درتصور مثل او

অর্থাৎ "আসমানে দীপ্তিমান সূর্য যদিও একটি কিন্তু এর কল্পনা করা যায়। কিন্তু ঐ সূর্য যার নিয়ন্ত্রণাধীন, কল্পনায় ও বাস্তবে তার কোন তুলনা নেই। কল্পনার জগতে তাঁর সত্তাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা কর, যাতে কল্পনায় তাঁর সাদৃশ প্রতিভাত হয়।"

সূফী ও আরীফদের চরিত্র-প্রকৃতি কি হওয়া উচিত, তা রূমীর বর্ণনায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। কবির ভাষায় ঃ

باشد ابن الوقت صوفی ای رفیق۔ نیست فردا گفتن از شرط طریق

অর্থাৎ "হে বন্ধু! সূফী সাধকগণ সময়ের প্রতি অনুরাগী (সময়ানুবর্তী) হবে, 'আগামীকাল করব'– এটা বলা তরিকতের পথে বাঞ্ছনীয় নয়।"

সর্বোপরি সংক্ষিপ্তভাবে এ মহাগ্রন্থের বিশেষত্বগুলোকে নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করা যায় ঃ

১. কোরআন ও হাদীসের অভ্যন্তরীণ দিকের বিস্তারিত বর্ণনা।

২. তরীকাত, মারিফাত ও হাকিকাতের গূঢ় রহস্যের বিস্তারিত বর্ণনা।

৩. আল্লাহর মহব্বত ও নিগূঢ় সম্পর্ক দৃঢ় করার পন্থা।

৪. নফস ও শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে আত্মরক্ষাও আত্মার পবিত্রতা অর্জনের উপায়।

৫. কামিল পীরের প্রতি অনুরাগী হওয়ার উৎসাহ।

৬. ভণ্ড পীরের সাহচর্য পরিত্যাগের তাগিদ।

৭. কিংবদন্তির নসীহতে কাহিনীকে অভিনব ভঙ্গিতে প্রকাশ করে মুল্যবান নসীহত রূপ দান।

৮. পারলৌকিক সুখ শান্তি লাভের উপায় বিজ্ঞান ও দর্শনের মাধ্যমে উপস্থাপন।

৯. আল্লাহর অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ দান।

মাওলানার মস্‌নবী কাব্যে বিস্তৃত আকারে বর্ণিত কাহিনীসমূহ ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁর আধ্যাত্মিক বিষয়াবলী একান্ত তাঁর নিজস্ব চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ, যা ইতোপূর্বে কারো কাব্যে এতো সুন্দরভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। তাই এ বিষয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 'মসনবী' এর প্রতি ধাবিত হতে হয়। কেননা মাওলানার পূর্ণাঙ্গ জীবনই তো প্রেম ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ।

তিনি কোন পেশাজীবী বা আক্ষরিক কবি ছিলেন না। তাঁর কাব্য ছিল ইশক ও আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ। এসব বিষয় তিনি জীবনী, কাহিনী ও ঘটনার পরম্পরায় বিবৃত করেছেন। এ পরিমণ্ডলে তিনি চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনেও সক্ষম হয়েছেন।

বস্তুতঃ মস্‌নবী হচ্ছে মানবীয় উচ্চাকাংখা ও প্রতিভার একটি বৃহৎ স্মৃতি-লিপি। এর ব্যগ্র-চেতনা, অনুপম গভীর আগ্রহ, উন্নত নৈতিক শিক্ষা, লিখন রীতির কঠোর সাধনা, নিপুণ রচনাশৈলী এবং সুর ও ভাবের গতিময়তাই এটাকে প্রশ্নাতীতভাবে সাহিত্য জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থে রূপায়িত করেছে। এ বিষয়টি সম্বন্ধে Dr. Najibullah এর বক্তব্য হচ্ছে,

> "His most famous work is mathnawi, the greatest of Persian and perhaps even of Islamic mystical monuments."[৪৯]

The New Encyclopaedia Britannica-তে বলা হয়েছে,

> "Jalal ad-Din ar-Rumi also called MAWLANA, the greatest Sufi mystic, and poet in the Persian language, famous for his lyrics and for his didactic epic Masnavi-ye Manavi ("spiritual couplets") which widely influenced Muslim mystical thought and literature."[৫০]

এ গ্রন্থে প্রগাঢ় অভিব্যক্তি মায়াবাদে পরিব্যপ্ত হয়ে এক অবর্ণনীয় মোহিনী শক্তিতে পরিণত হয়েছে যা প্রায় হাজার বছর অবধি পৃথিবীর মানুষকে আকৃষ্ট করে রেখেছে এবং অনাগত কালেও বিশ্বমানবতাকে পথ প্রদর্শন করবে।

মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমী মসনবীর বিশাল মূল্যবান রত্নভাণ্ডারে অবগাহন করলে এক ঐশী চেতনা ও অনুপম পুলক পাঠক হৃদয়কে আলোড়িত করবে. করাটাই স্বাভাবিক। Wilson বলেন,

"His book should be read not only by the students of theology but by students as a book of general philosophy."[৫১]

নিঃসন্দেহে বলা যায়, সূফীদের ভাষায় যেমন তাদের হৃদয়ঙ্গমকৃত বিষয় প্রকাশ কঠিন, তেমনি একজন সূফী কবির উপর সার্বিক বিশ্লেষণ ও দুরূহ ব্যাপার। আর মাওলানা রূমীতো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সূফী সাধকদের অন্যতম, তাই তাঁর উপর আলোচনার যেন অন্ত নেই। A. J. Arberry এর বর্ণনা মতে,

"His odes reach the utmost heights of which a poetry inspired by vision and rapture is capable, and these alone would have made him the unchallenged laureate of Mysticism."[৫২]

তথ্যনির্দেশ

১. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১১শ খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২) পৃ. ৫১৬।
২. ড. যাবীহুল্লাহ্ সাফা, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, ২য় খণ্ড (তেহরান ঃ রামীন প্রকাশনী, দশম মুদ্রণ, ১৯৯৫) পৃ. ৯৭।
৩. A. J. Arberry, *Classical Persian Literature* (London : George Allen and Unwin Ltd. 1958).P. 214.
৪. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫২০।
৫. Joel Waiz Lal, *An Introductory History of Persian Literature* (Delhi : The Imperial Book Depot Press, 1925), P. 131
৬. ড. যাবীহুল্লাহ সাফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।
৭. ড. তাওফীক সুবহানী, *তারিখে আদাবিয়াত* (তেহরান ঃ পায়ামে নূর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৯০) পৃ. ২৫১-২৫২।
৮. তদেব, পৃ. ২৫৩।
৯. ড. মুহাম্মদ মুঈন, *ফারহাঙ্গে ফার্সী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (তেহরান ঃ আমীর কবির পাবলিকেশন, একাদশ মুদ্রণ, ১৯৯৫), পৃ. ২০৪৯।
১০. A. J. Arberry, *op. cit.*, p. 215.
১১. Dr. Najibullah, *Islamic Literature* (New York : USA, 1961), p. 283.
১২. ড. যাবীহুল্লাহ সাফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।
১৩. Dr. Najibullah *op. cit*., p. 283
১৪. নিযামুদ্দীন নূরী, *বারকেয়ে শামস দার আ'য়নে* (তেহরান ঃ তাওহীদ প্রেস, ১৯৯০), পৃ. ৯৩
১৫. তদেব, পৃ. ৯৬।
১৬. তদেব, ৯৬-৯৭।
১৭. তদেব, ৯৭।
১৮. মাওলানা আব্দুল মজীদ (অনু.) *মস্‌নবীয়ে রূমী*, ১ম খণ্ড (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৫), পৃ. ১০
১৯. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫২০।
২০. ড. সাইয়্যেদ যিয়াউদ্দীন সাজ্জাসী, *মোকাদ্দামে-ঈ-বর মাবানীয়ে ইরফান ওয়া তাসাউফ* (তেহরান, ১৯৯৩), পৃ. ১৪৮।
২১. A. J. Arberry, op. cit., p. 216.
২২. আব্দুস সাত্তার, *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম* (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৯) পৃ. ৫১।
২৩. বদীউজ্জামান ফরূযানফার, *যিন্দেগানীয়ে মাওলানা জালাল উদ্দীন মোহাম্মদ মাশহুর বে মৌলভী* (তেহরান ঃ যাওয়ার প্রকাশনী, ১৩৭৬), পৃ. ৮৯-৯০।
২৪. B. Lewis Ch., and J. Schacht Ledein E.J. Brill, *The Encyclopaedia of Islam* (The Netherlands, 1983), p. 395.

২৫. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, *মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী*, ১ম খণ্ড (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯), পৃ. ২০১।
২৬. মাওলানা আব্দুল মজীদ (অনু.) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১।
২৭. A.J. Arberry, op.cit.,p. 222.
২৮. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫২০।
২৯. মীর্যা মকবুল বাদাখশানী বেগ, *আদাবনামায়ে ইরান* (লাহোর ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস এজেন্সী), পৃ. ৪২৭।
৩০. *The New Encyclopaedia Britannica: Macropaedia,* Vol. 10 (Chicago : Helen Hemingway Benton Publisher, 1973-1974), p. 14.
৩১. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫২২।
৩২. রেনল্ড এ নিকলসন (সম্পা), *মসনবীয়ে মা'নবী* (তেহরান ঃ বাহযাদ পাবলিকেশন্স, অষ্টম মুদ্রণ, ১৯৯৬) পৃ. ৫।
৩৩. তদেব।
৩৪. তদেব।
৩৫. মনির উদ্দীন ইউসুফ, *রূমীর মসনবী* (ঢাকা ঃ ওসমানিয়া বুকডিপো, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৩ বাংলা), পৃ. ৯।
৩৬. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯-২০০।
৩৭. ড. আব্দুল হুসাইন যাররীনকুব, *সীরী দার শেরে ফার্সী* (তেহরান ঃ হায়দারী প্রেস, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯২), পৃ. ৩২১।
৩৮. রেনল্ড এ নিকলসন (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।
৩৯. তদেব পৃ. ৬।
৪০. তদেব।
৪১. তদেব।
৪২. তদেব।
৪৩. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫২২।
৪৪. শ্রী হরেন্দ্র পাল, *পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস* (কলকাতা ঃ শ্রী জগদীস প্রেস, ১ম সংস্করণ, ১৩৬০ বাংলা), পৃ. ১০৫।
৪৫. রেনল্ড এ নিকলসন (সম্পা) প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।
৪৬. তদেব।
৪৭. মাওলানা আব্দুল মজীদ (অনু.) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩।
৪৮. রেনল্ড এ নিকলসন (সম্পা) প্রাগুক্ত, ১০।
৪৯. Dr. Najibullah op.cit.,p. 184.
৫০. *The New Encyclopaedia Britannica : Macropaedia,* Vol. 6 (Chicago, 15th edition, 2002) p. 475.
৫১. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।
৫২. A.J. Aarberry, op.cit.,p. 216.